BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03080022

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 08| August 2025| e-ISSN: 2584-1890

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার যাত্রায় রুচির বিকৃতি ও সঙ-এর উদ্ভব : একটি অনুসন্ধান

Minati Sau Bhaumik & Dr. Sanchita Banerjee Roy[2]

1. Research Scholar, Dept. of Bengali, YBN University, Ranchi, Email: saubhaumikminati@gmail.com
2. Asst. Professor, Dept. of Bengali, YBN University, Ranchi, Email: banerjeesanchita28@gmail.com

Abstract:

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশ ঐতিহ্যবাহী, ভক্তি-কেন্দ্রিক যাত্রা পরিবেশনার জন্য অনুকূল ছিল না। শহরটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এই সময়কালে জনসাধারণের রুচির অবক্ষয় ঘটেছিল। এই পরিবেশে যাত্রা তার ঐতিহ্যবাহী চরিত্র এবং ভক্তিমূলক চেতনা হারিয়ে ফেলে। যেখানে অতীতের বৌদ্ধিক এবং শৈল্পিক সাধনাগুলি চটুল নৃত্য, সস্তা গান এবং প্রহসনমূলক নাটকের মতো অশ্লীল বিনোদন (সঙ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এর ফলে 'শখের যাত্রা'র উত্থান ঘটে, যা প্রায়শই ঐতিহ্যবাহী যাত্রার মূল নীতিগুলি, যেমন একটি সুসংগত আখ্যান, পরিত্যাগ করে। যদিও কিছু পরিবেশনা 'নল-দময়ন্তী'র মতো পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, তবুও সেগুলির গাম্ভীর্য কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং কবি-গানের মজাদার এবং তুচ্ছ শৈলীতে আচ্ছন্ন করা হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর কামোত্তেজক এবং চাঞ্চল্যকর প্রভাবও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, যা যুগের বিকৃত নান্দনিক বোধকে রূপ দেয়। রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'নন্দবিদায়'-এর মতো পরিবেশনাগুলিকে যাত্রার একটি 'নতুন ধরণ' হিসেবে প্রশংসিত করা হয়েছিল। তবে, এর অভিনবত্ব ছিল এর নাট্য কাঠামোতে নয় বরং এর উপস্থাপনায়। এতে অর্ধ-আখড়াই দ্বারা প্রভাবিত উচ্চতর সঙ্গীত, উন্নত পোশাক এবং একজন মহিলা শিল্পীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। যাত্রার সঙ্গীতের ধরণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে কবিগানের শৈলী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

Keywords: *যাত্রা, সঙ, সখের যাত্রা, ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার জনরুচি, রুচিবিকৃতি, সংস্কৃতির অধোগতি, নববাবু, কবিগান, বিদ্যাসুন্দর।*

Introduction:

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কলকাতা নিছক ভক্তিরসাত্মক পালা উপভোগ করার মতো মানসিক অবস্থায় ছিল না। তাই জনরুচির তাগিদে গোবিন্দ অধিকারী রচিত বা অভিনীত পালাগুলির অঙ্গে বিষয়-নির্বাচনে, সুর-নির্বাচনে এবং শব্দ ও অলংকার-যোজনায় যুগচিহ্ন ফুটে উঠেছিল। কলকাতা তখন লাম্পট্য শিক্ষার শিক্ষাগার হয়ে উঠছে। তাই যাত্রার এই পুরাতন সুর শহর কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামী নদীয়ার অধিবাসী, কিন্তু পূর্ববঙ্গে গিয়েই তাঁর

প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হল। কলকাতায় তখন শুরু হয়েছে সখের যাত্রার সৌখিনতা; সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী নাট্যসাহিত্যের ও নাট্য-অভিনয়ের প্রভাবে এক নতুন নাট্যধারার জন্ম হচ্ছে।

Discussion

কলকাতায় তখন ধর্মবুদ্ধি শুধুই প্রমোদবুদ্ধি। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে দেখা দিতে শুরু করে। প্রথমে খ্রিস্টান পাদরীদের সঙ্গে পাঞ্জা কষা। পরে সংঘর্ষের আসর বদলে গেল। একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে পৌত্তলিকদের সংঘর্ষ শুরু হল, উন্নতিকামীদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশুরামদের যাত্রা শিশুদেরই কেবল প্রীতির কারণ হতে পারে- বয়সে শিশু ও মানসিকতায়। এই প্রমোদকলা যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়নি- কারণ তার মুখ ভবিষ্যতের দিকে নয়, ছিল অতীতের দিকে। কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন—

"যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকার হেম্মত থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্মকাণ্ড, আমোদ-প্রমোদ ও কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিভের মত, ব্যবহারে কেবল 'ওয়েদর ককে'র কাজ করে। দেখুন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ কত্তেন, নাটক ঘোটকের অভিনয় দেখতেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু আজকাল আমরা বারোয়ারিতলায় নয় বাড়িতে, বেদেনীর নাচ ও 'মদন আগুনে'র তানে পরিতুষ্ট হচ্চি; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে পুতুল নাচ, পাঁচালী ও পচাখেউড়ে আনন্দ প্রকাশ কচ্চি, যাত্রাওয়ালাদের 'ছকুবাবু' ও সুন্দরের সং নাবাতে হুকুম দিচ্চি। মল্লযুদ্ধের তামাসা 'দ্যাখ বুলবুল ফাইট' ও 'ম্যাড়ার লড়াইয়ে' পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেছেন, আজকাল আমরা সর্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি।"(১)

কলকাতা শহরের এই রুচিবিকৃতি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কালীপ্রসন্ন সিংহ আরও লিখেছেন—

"কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগল তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ-আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ করে; শহরের যুবকদল গোথুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন; টাকা বংশগৌরবকে ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকাতার কায়েত-বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো।"(২)

কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর যুগের চিত্র যথাযথ দিয়েছেন; কারণ এটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু ইতিহাসের বিবরণ যথেষ্ট ঐতিহাসিক নয়। কৃষ্ণচন্দ্র, মানসিংহ- এঁরা কেউই সুরুচির ধারক ছিলেন না, আর নাটকও তখন সুস্থ ও সুকুমার ছিল না। তবে অষ্টাদশ শতকের কলকাতা নতুন ধরনের সংস্কৃতি-কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শুধু বিদেশী বণিকের নয়, বিদেশী ধর্মগুরু ও প্রচারকদের কর্মস্থল কলকাতা। কলকাতায় পুরাতন মূল্যবোধ ও নতুন মূল্যবোধ পাশাপাশি বহুকাল বসবাস করে; এদেশ জয় করলেও ইংরেজরা এদেশের অর্থনীতিক ও সামাজিক মৌলিক পরিবর্তনে বাধা দিয়েছে। তাদের শোষণের ফলে পুরাতন সমাজ ভেঙে পড়ছে, কিন্তু নতুন কিছু গড়ে উঠতে কেউ সাহায্য করেনি। সমাজ-বিজ্ঞানী মার্ক্স বলেছেন—

"England has broken down the whole framework of Indian society, without any symptoms of reconstruction yet appearing. This loss of his old world, with no gain of a new one, imports a particular kind of melancholy to the present misery of the Hindus and separates Hindoostan, ruled by Britain from all its ancient traditions and from the whole of its past history."(৩)

তবু নতুন একটা সমাজ গড়ে উঠেছে। প্রথম যুগে এই নবীন সমাজ ছিল খুবই উন্নাসিক। আর পুরাতনের পূজারিরা ক্রমশ অবক্ষয়ের গহ্বরে প্রবেশ করতে লাগল। এই যুগে ধর্মের নামে ধর্মের বিকৃতি একটি সাধারণ সত্য হয়ে পড়েছিল। রাজা রামমোহন রায় লিখেছেন—

"নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্ধদণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরি কাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্যন্তরও নিন্দা এবং সর্বদা এইভার দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড ভিন্ন আহার হয় না।"(৪)

হুতোম এদেরই বলেছেন বকধার্মিক; সেই বকধার্মিকের স্বরূপ এইভাবে বর্ণিত—

"বকধার্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মতো নুদুরনাদুর- ভুঁড়িটি বিলাতী কুমড়োর মতো মাথা-কামান চৈতন ফক্কা ঝুঁটি করে বাঁধা। গলায় মালা ও ঢাকের মতো গুটিকতক সোনার মাদুলী, হাতে ইষ্টিকবচ- চুলে ও গোঁফে কলফ দেওয়া- কালাপেড়ে ধুতি, রাম জামা ও জরির বাঁকাতাজ, গত বৎসর আশী পেরিয়েছেন- আজ ত্রিভঙ্গ। কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে। গেরস্ত গোচের ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্ছেন- হরিনামের মালার ঝুলিটি, ঘুরুচ্চেন। ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।"(৫)

-এ চিত্র বড় পরিচিত চিত্র, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিও অতিশয় পরিচিত। লালবিহারী দে খ্রিস্টীয় মতাবলম্বী এবং ধর্মযাজক ছিলেন। কিন্তু তাঁর পদ্য সমালোচনায় বাস্তব অবস্থা বর্ণিত হয়নি -এমন কথা বলা যায় না—

"নিয়মিত দুর্গোৎসব করে যেই জন।

সর্বদা করায় যদি ব্রাহ্মণ ভোজন॥

যে জন যদ্যপি সদা করে সুরাপান।

আর প্রতি রাত্রি যদি যবনান্ন খান॥

গোমাংস শুকর মাংস করিতে ভোজন।

ইংরেজের হোটেলেতে করেন গমন॥

যবনী রমণী যদি করেন রমণ।

তথাপি তাহার জাতি মারে কোনজন॥"(৬)

পুরোনোপন্থীরা পুরোনো আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করে নিয়েছে তাদের রুচি ও রসবোধ অনুযায়ী। নববাবুদের বিলাসলীলার বর্ণনা নানাস্থানেই আছে। তাস-পাশা-বড়ে টিপে, আখড়াই, হাফ-আখড়াই শুনে, বুলবুলির লড়াই দেখে আর ঘুড়ি উড়িয়ে, গাঁজা-চরস-মদ-আফিও-ভাঙ নেশাদি করে, দাঁতে মিশি; চুলে কলপ ও চোখে সুরমা দিয়ে, কাস্তে পেড়ে ধুতি ও বুটিদার পাঞ্জাবী পরে এই হঠাৎ-বাবু সমাজ ব্রিটিশ ছত্রছায়ায় অতি আরামে জীবন অতিবাহিত করছিল। যাত্রা গান তাদের খপ্পরে পড়ে তার চরিত্র হনন করল—

"লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, শুদ্ধ নামটা সই করতে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশ পরম্পরায় স্থির বিশ্বাস ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না। যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকার হেম্মত থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্মকাণ্ড, আমোদ-প্রমোদও করবার প্রচলিত হয়। কলকাতা শহরে এখন চলছে, বেদেনীর নাচ, ছকুবাবু ও সুন্দরের সঙ, আর 'মদন আগুনের' তান।"(৭)

বস্তুত এগুলি নতুন আমদানী কিছু নয়, সমাজের নিম্নস্তরে শ্লীল-অশ্লীল পাশাপাশি অবস্থান করত। লোক সংস্কৃতির সবটুকুই নির্মল ও পবিত্র নয়। তবে বিশেষ যুগ ও বিশেষ সমাজব্যবস্থা এগুলির প্রশ্রয়দাতার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সমাজপতিদের উৎসাহেই সংস্কৃতির অধোগতি শুরু হয়, এটা সাধারণ ঘটনা—

"পূর্বেকার অতি প্রধান প্রধান মহিমান্বিত অর্থাৎ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ লোকেরা এবম্ভূত অদ্ভুত স-কার ব-কারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, আমোদের পরিসীমা থাকিত না। জ্ঞাতিকুটুম্ব, স্বজন, সজ্জন, পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গদগদ চিত্তে শ্রবণ করিতেন।"(৮)

নবকৃষ্ণ বাহাদুরের রুচিজ্ঞান সম্বন্ধে বিবিধার্থ সংগ্রহ-এর সম্পাদকও সমালোচনা করেছেন—

"লাম্পট্যদোষে তাঁহার সমুদায় গরিমা কলুষিত হইয়াছিল।"(৯)

ঈশ্বর গুপ্তও সমালোচনা করে লিখেছেন—

"কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য বিনোদনের উৎসাহী হন।"(১০)

-এ হেন পরিবেশে কলকাতার সংস্কৃতি-জগৎ যে পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হবে, এটা বিস্মিত হবার মতো সংবাদ নয়। কবিওয়ালাদের সকলেরই জন্ম এইযুগে—

হরুঠাকুর-	১১৪৬ - ১২২১ বঙ্গাব্দ
নিধুবাবু-	১১৪৮ – ১২৪৫ বঙ্গাব্দ
নিতাই বৈরাগী-	১১৫৮ – ১২২৮ বঙ্গাব্দ
লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস-	১১৫৮ – ১২২৬ বঙ্গাব্দ
রাম বসু-	১১৯৩ – ১২৩৫ বঙ্গাব্দ

শুধু কবিসঙ্গীত নয়, বিদ্যাসুন্দর-প্রভাবিত আখ্যানমূলক কাব্য অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি সে যুগের বিকৃত রসচেতনার সাক্ষ্য বহন করছে—

"ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-এর আদর্শে কয়েকখানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'চন্দ্রকান্ত', কালীকৃষ্ণদাসের 'কামিনীকুমার' ও রসিকচন্দ্র রায়ের 'জীবনতারা' এই কাব্যত্রয় লোকরুচির উপর বহুদিন দৌরাত্ম্য করিয়াছিল।"(১১)

শুধু এই কাব্যত্রয় নয়, এক বিপুল কবিগোষ্ঠীরই জন্ম হয়েছিল- এঁদের কেউ কেউ হয়তো পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করছেন -এইরূপ ভান করেছেন। আসলে তাঁরা ভারতচন্দ্রীয় ভাবধারাকে পুষ্ট করেছেন। যেমন—

১। মদনমোহন তর্করত্ন- বাসবদত্তা (১৮৩৭)

২। তারাচাঁদ দত্ত- মন্মথকাব্য (১৮৪৪)

৩। মুন্সী এবাদত- কুরঙ্গভানু (১৮৪৫)

৪। উমাচরণ ত্রিবেদী- মদনমাধুরী (১৮৫৬)

৫। বনমালী ঘোষাল- পদ্মগন্ধ উপাখ্যান (১৮৬৪)

৬। বিশ্বম্ভর দাস- রজনীকান্ত (১৮৭০)

৭। গোবিন্দ শীল- হেমলতা-রতিকান্ত (১৮৭০)

-প্রতিভাহীন ব্যক্তিদের কবলে পড়ে বিদ্যাসুন্দরীয় রুচি আরও কালিমালিপ্ত হল। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে মাইকেলের সচেতনতা লক্ষণীয়—

"The Father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius."(১২)

যাত্রা এই যুগে তার চরিত্র সুস্থির রাখতে পারল না। প্রমোদলিপ্সু সমাজে কৃষ্ণলীলা থেকে ভক্তিবাদ বর্জিত হল। মাথুর থাকলেও প্রেমবৈচিত্ত্যের আর কোন স্থান থাকল না—

"যাত্রার অধিকারী বয়স ৭৭ বৎসর, বাবরিকাটা চুল, কপালে উল্কী, কানে মাকড়ি। অধিকারী দূতী সেজে গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলেকে সখী সাজিয়ে আসরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন, তারপর ব্যাসদেব ও মণি গোঁসাই গান করে গেলেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত 'কালো জল খাবো না!' 'কালো মেঘ দেখবো না!' 'কালো কাপড় পরবো না'। ইত্যাদি কথাবার্তায় ও 'নবীন বিদেশিনীর' গানে লোকের মনোরঞ্জন করেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরান বনাত, পচা শালের গাদী হয়ে গেল। আধুলি, সিকি ও পয়সা পর্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে 'বাবা আমার বিয়ে' ও 'আমার নাম সুন্দর জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে' প্রভৃতি রকমারি গানেরও অভাব ছিল না। বেলা আটটার সময় যাত্রা ভাঙ্গলো।"(১৩)

বলা বাহুল্য, 'কেঁদেলি'র শিশুরাম এখানে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় সাবালক হলেন—

"শিশুরামের পর শ্রীদাস-সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রায় পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে।"(১৪)

-হুতোমের সাক্ষ্যে এই কৃতকার্যতার স্বীকৃতি মাত্র নেই। যাত্রার মধ্যে রঙ্গতামাশা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে, দর্শকের মুখ চেয়ে সঙ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কলকাতা ত্যাগ করে সুন্দর পূর্ববঙ্গে গিয়ে আত্মরক্ষায় সমর্থ হল যাত্রায় একটি অংশ।

সেই অর্ধশূন্য আসরেই শুরু হল সখের যাত্রা। এতদিন চুঁচড়া, কৃষ্ণজ্ঞাগর, চন্দননগর, উলা বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে নানা পূজাপার্বণ উপলক্ষে এক প্রকার সঙ বের হত; সেই সঙ যাত্রার আসর দখল করে বসলো। বিদেশীরা এদেশে এসে কৃষ্ণযাত্রা দেখে আকৃষ্ট হননি; কিন্তু এই সঙ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লেবেডেফ কেন 'সঙবদল' অনুবাদ করেছিলেন, তার কারণটি তাঁর হিন্দী ব্যাকরণের ভূমিকায় উল্লিখিত—

“আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম ভারতবর্ষীয়েরা সোজাসুজি গম্ভীর বাস্তব বুদ্ধি ভাবনার- তাহা যতই শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে বলা হউক না কেন- তাহার অপেক্ষা ভেঙ্গানি ও ভাঁড়ামি বেশি পছন্দ করে।”(১৫)

-এই কারণে লেবেডেফ নাটক রচনা করেছিলেন সঙ সৃষ্টির মেজাজ নিয়েই।

এই সঙ দেখবার ও দেখাবার প্রবৃত্তি অতি আদিম লোক-প্রমোদকলা। এখনও আদিম জাতিগুলির মধ্যে এবং অনগ্রসর কৌম সমাজে সঙ-এর ব্যাপক প্রচলন আছে। কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার জন্য, কখনও নিছকই ছদ্মবেশ বা বহুরূপীর বেশ ধরে সাধারণ মানুষকে আনন্দ দান করার জন্য সঙ বের করা হত। সঙ-এর সঙ্গে নাচ ও গান সমানভাবে চলে। অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় ব্যাপক হারে সঙ-এর প্রচলন ছিল; দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, দোল প্রভৃতি উৎসবে সঙ প্রদর্শিত হত। পরে পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠানেও সঙ বের করা হত- গৃহ-প্রবেশ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ এমন কি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সঙ প্রদর্শন করা হত।

আগে শুধু মাঝেমাঝে সঙ-এর জন্য আসর ছেড়ে দিত যাত্রা। অচিরেই যাত্রাকে বিদায় নিতে হল; সঙ এসে আসর দখল করে বসল। অর্থাৎ যাত্রার মধ্য থেকে যখন গভীর গম্ভীর সুর সম্পূর্ণ বিদায় গ্রহণ করল, তখন সবটাই দাঁড়াল কৌতুক ও হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপার। প্রমোদকলায় ‘প্রমোদ’ শব্দটিই সর্বেশ্বর হয়ে পড়ল। সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল—

“এইক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে অনেক প্রকার ছদ্মবেশধারী বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সঙ হইয়া থাকে। তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী সং আইসে, দ্বিতীয়তঃ সং কলিরাজা, তৃতীয়তঃ সং রাজার পাত্র, চতুর্থ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী, পঞ্চম সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী, ষষ্ঠ সং ঐ সাহেবের দাস দাসী। এ সকল সং ক্রমে আগত একত্রে মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সংবলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি স্বর ন্যকৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানা দিদেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন। এই অপূর্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক বিজ্ঞলোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন। অতএব বুঝি ক্রমে ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটি হইতে পারে।”(১৬)

-এই যাত্রাকে ‘যাত্রা’ বললে যাত্রার মর্যাদা নষ্ট করা হয়। যাত্রায় একটি কাহিনী থাকত, সেই কাহিনীর বিকাশ দেখানো হত, আর সমস্ত পালাটিতে বাজত একটি গম্ভীর আধ্যাত্মিক সুর। গীতগোবিন্দ থেকে গোবিন্দ অধিকারী পর্যন্ত যাত্রার এই চরিত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। তার শিল্পগত মূল্যের তারতম্য ঘটেছে, কিন্তু প্রকৃতি বা স্বরূপের কোন রদবদল হয়নি। সখের যাত্রা যাত্রার মূল প্রকৃতি ধরে নাড়া দিয়েছে। সখের যাত্রা আসলে যাত্রা নিয়েই সৌখিনতা। উদ্ধৃত বিবরণে আমরা প্রথমত দেখতে পাই, ঐ যাত্রার মধ্যে কোন ধারাবাহিক কাহিনী নেই, কাজেই তাকে একটি পালা বলা চলে না। নানা জাতের ছদ্মবেশী একত্রে মিলিত হয়ে কৌতুক রস পরিবেশন করছে, কোন গল্প গড়ে তুলছে না। এই ধরনের সখের ‘যাত্রা’র জন্ম হয়েছে সব কিছু প্রাথমিক শর্ত অস্বীকার করে। কিন্তু এমন সখের যাত্রারও দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে এতটা কালাপাহাড়ী নীতি প্রথমে অবলম্বিত হয়নি। সমাচার দর্পণে আরও লেখা হয়েছিল—

“মহাভারত প্রসিদ্ধ নল-দয়মন্তীর যে কথা আছে সে অতি সুশ্রাব্য ও মনোরম এবং নব রস সম্পূর্ণ প্রসাদ অতএব শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিরা স্বীয় শক্ত্যনুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করতে মহাকবিত্বে খ্যাত ও মান্য হইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতী ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গে এক যাত্রা দৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য ও গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন।”(১৭)

ঐ যাত্রার কথোপকথন ও সঙ্গীতের নমুনা ‘সংবাদ প্রভাকরে’ কিছু উদ্ধৃত হয়েছে। নলদময়ন্তীয় উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দরের আবেদন আত্মস্থ করে এক নতুন রসের ভাণ্ডার খুলেছে—

“কলিকাতার নিজ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক ‘নলদময়ন্তী’ যাত্রার দল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলে সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইটি গানের কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। যথা,

কেন গো, সজনী আমার, উড়ু উড়ু

করে মন।

পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারি

আকিঞ্চন॥

তথা।

নল্ নাম্ নল। বলিস্ কি, বা বল্।

দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল,

কি সেই, কুল মজানে কামানল্॥”(১৮)

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর পরে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দুইটি মাত্র গান আমাদের উপহার দিয়েছেন। অথচ তার থেকেই এই যাত্রার চরিত্র উপলব্ধি করতে পারি। মহাভারতীয় গল্পের স্বতোসিদ্ধ পৌরাণিক ভব্যতার লেশ মাত্র অবশিষ্ট নেই। উনিশ শতকের স্ফুর্তিবাজ সমাজের এই চটকদার কবিয়াল তার কিছু অবশিষ্ট রাখেননি। এই যাত্রায় দুইটি অংশ ছিল, ছড়া আর গান। ইতিপূর্বে আমরা গোবিন্দ দাস অধিকারীর পালা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, সেখানেও ছিল ছড়া আর গীত। ছড়াগুলি সুর করে বলা হত, আর গীতগুলি রাগরাগিণী তাল সহ গীত হত। যাত্রার বাহা কাঠামো এখানে বজায় রাখার চেষ্টা করা হলেও আসলে এগুলিও ছিল সপ্ত-মজাদার রঙ-তামাসা। সমসাময়িক যুগের পত্রিকাসমূহ এগুলিকে ‘সঙ’ নামে অভিহিত করে বিধিবহির্ভূত কাজ করেনি। যাত্রার এই রঙদার স্বভাব বেশ কিছুদিন ধরে বজায় ছিল।

সমাচার দর্পণ থেকে জানা যায় যে, জগন্মোহন বসুর বাগানবাটীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা হয়েছিল। সেই যাত্রাও আসলে ছিল সঙ—

“রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ যাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমতকালে একটা রাক্ষস তিনটা শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হইত জিজ্ঞাসা করে আমাদের মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও, রাজা পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অনুমতি দেন ইত্যাদি ইহাতে নানাপ্রকার সং অতি সুসজ্জিত হইয়া থাকে এবং ব্যক্তি বিশেষের সং আসিয়া প্রথমতো নানা রাগরাগিণীযুক্ত সুস্বরে গান করে এই সকল দর্শন করিয়া তাবৎ লোক হায় হায় ধবনি করিয়াছিলেন।”(১৯)

যথার্থ সঙ-এর বাজার তখন বেশ চড়া। চুঁচুড়ায় চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তখন দারুণ সঙ বের হচ্ছে। আবার কবিগানের আসরে সঙ এনে হাজির করা হচ্ছে। নন্দকুমার সেট এই রকম এক সঙ উপস্থাপিত করেছিলেন- হাজি সাহেবের সঙ। সংবাদ হিসাবে তখনকার সংবাদপত্রে স্থান পেয়েছিল। সখের যাত্রা কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনী পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্র পথে চলল। মহাভারত বা অন্য কোন পৌরাণিক সূত্রে তার এই স্বেচ্ছাবিহার চূড়ান্ত হতে পারে না। খোঁজ পড়ল অন্য সূত্রের। কামরূপ যাত্রা প্রকাশ পেল, তর্জমা করলেন জগম্মোহন বাবু; শ্যামসুন্দর সরকারের গৃহে তার গাওনা হল। সম্ভবত বাংলাদেশের তৎকালীন রস-উপলব্ধিতে তার কোন সাড়া ছিল না। তখন বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গ এল; ইতিপূর্বে অন্যবিষয়ক পালা অভিনয়ে শুধু তার সহায়তা নেওয়া হত। লেবেডফ তাঁর 'সঙবদল' পালায় ভারতচন্দ্রের গীত (বিদ্যাসুন্দর থেকে) ব্যবহার করেছিলেন। এবার সোজাসুজি বিদ্যাসুন্দর এল, পর-নির্ভরতার পালা চুকিয়ে।

এই সময়ে ১৮২৬ সনে মণিপুর থেকে এক যাত্রা দল এল। মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা অভিনীত হল; কিন্তু তখন ঐ প্রকার যাত্রা শ্রবণ ও তার রসগ্রহণ-উপযোগী মনোভাব বাঙালী দর্শকের ছিল না। পদ্যে এক সমালোচনা বের হল। সেই সমালোচনা থেকে কয়েকটি খবর জানা যায়—

১। পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে;

২। স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল;

৩। গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চ স্বরা।

শুনিলে সে মিষ্ট স্বর না যায় পাসরা।

৪। বাদ্যতালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্ফ।

৫। গান করে জয়দেব মূদ্রা তার কম্প।(২০)

মোটামুটি এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে, এই যাত্রা আসামের 'অংকীয়া নাটে'র সমগোত্রীয় যাত্রা। কিন্তু জয়দেব-পদ-ভিত্তিক এই পালা নারী অভিনেত্রীর উপস্থিত সত্ত্বেও জনসমাদর অর্জন করল না। মণিপুরীদের নাট্যানুষ্ঠান 'লম্ফঝম্ফ' রূপে প্রতীয়মান হল। আসলে কলকাতার বাবুরা 'নামঘরে'র যাত্রা আর শুনতে চান না; তাঁরা তখন বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে ফুরশি টানতে টানতে অর্ধ নিমীলিত লোচনে অন্য জাতের প্রমোদকলার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তাই 'নন্দবিদায়'-এর মত যাত্রাও 'নতুন ধরনের যাত্রা' বলে অভিনন্দিত হচ্ছে—

"জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নন্দবিদায় নামক যে এক নতুন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে সুর ও গীত প্রস্তুত করেন তাহা শ্রবণ করিয়া সাধারণ গোচরার্থে আমি এই পত্র লিখিলাম।"(২১)

-তখনও সুর এবং গীত যাত্রার উল্লিখিত বিষয়, সংলাপ নয়। অথচ নতুন রীতি বলে বিদিত।

Conclusion

রামচাঁদবাবু হাফ-আখড়াই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এই যাত্রার সঙ্গে হাফ-আখড়াই সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সংবাদপত্রে আরও লেখা বেরিয়েছিল—

"যে সকল ব্যক্তিরা সাজিয়াছিলেন তাহারদের বস্ত্রালঙ্কারাদি অতি উত্তম হইয়াছে, বেহালা তবলা এবং ঢোলক বাদকেরা অতিশয় গুণান্বিত এবং গীত সকলের মধ্যে প্রচুর কবিতাশক্তি প্রকাশ আছে, বোধ করি বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে মহাকবি নিধুবাবুর টপ্পার সমান অনেক হইবে, প্রায় তাবৎ গীত হাফ আখড়াই খেয়াল কীর্তনের এবং টপার সুরেতে গাহনা হইবাতে অতিশয় মিষ্ট ও সুশ্রাব্য হইয়াছিল, শ্রীযুত বাবু তিতুরাম বড়াল, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র (কি উপাধি জানি না) প্রভৃতি যাহারা নন্দ মন্ত্রী এবং উপানন্দ সাজিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যাঁহারা আসরে বসিয়াছিলেন তাঁহারা যে গান করিলেন বোধ করি এ প্রকার গান সচরাচর শুনা যায় নাই তাঁহাদের হাফ-আখড়াইর সুরে পয়ার কাটান বড় চমৎকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সর্বোপরি ছিদাম নাম্নী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং চমৎকৃত করিয়াছে, ছিদামের বয়স ঊর্ধ্ব ১৩ বৎসর।"(২২)

-এখানেও সেই গীত এবং সুরের প্রশংসা। সাজ-সজ্জার ব্যবহার বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, সংলাপ যা ছিল, তা পরিষ্কার পয়ারের কাটান। অর্থাৎ হাফ-আখড়াই-এর রকমফের। এ যাত্রার নতুনত্ব নারী-অভিনেত্রী আমদানীর উপর নির্ভরশীল বলে অনুমিত হয়। কারণ, 'কালিরাজার যাত্রা' থেকে যে জাতীয় 'নতুনত্ব' চালু হয়েছে, 'নন্দবিদায়ে' এসে তার থেকে কোন অগ্রগতি চোখে পড়ছে না। তবু সম্বাদ ভাস্কর লিখেছিল—

"এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এযাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার।"(২৩)

ওই কবিওয়ালাদের যুগে 'পয়ার-কাটান' নিশ্চয়ই খুব সাধুবাদ কুড়িয়েছিল। যাত্রা-সঙ্গীতকে অচিরেই কবি-সঙ্গীত প্রায় গ্রাস করে ফেলল, প্রমাণ বিদ্যাসুন্দর।

Reference:

(১) সিংহ, কালীপ্রসন্ন। হুতোমপ্যাঁচার নক্সা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃষ্ঠা- ১১৪

(২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮

(৩) Marx, Karl. (1853, June 25). 'The British rule in India', New-York Daily Tribune. historyisaweapon.com/defcon6/works/1853/06/25.html

(৪) রায়, রামমোহন। (১৯৭৩)। চারি প্রশ্নের উত্তর, রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ২৫৫

(৫) পূর্বোক্ত, হুতোমপ্যাঁচার নক্সা, পৃষ্ঠা- ৩৪

(৬) দে, লালবিহারী। (১৮৫৭)। অরুণোদয় সাহিত্য পত্রিকা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

(৭) পূর্বোক্ত, হুতোমপ্যাঁচার নক্সা, পৃষ্ঠা- ১১৫

(৮) সংবাদ প্রভাকর, ১ পৌষ, ১২৬১

(৯) মিত্র, রাজেন্দ্রলাল। (১৭৮০ শকাব্দ)। বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ সংখ্যা

(১০) গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র। (১২৬৬)। সংবাদ প্রভাকর, ১ অগ্রহায়ণ

(১১) সেন, দীনেশচন্দ্র। (১৯০১)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, পৃষ্ঠা- ৫৭৬

(১২) বসু, যোগীন্দ্রনাথ। (১৯০৫)। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, পৃষ্ঠা- ৩১৩

(১৩) পূর্বোক্ত, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, পৃষ্ঠা- ৩৫

(১৪) পূর্বোক্ত, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১৭৮০ শকাব্দ

(১৫) রাহা, শতঞ্জীব। (২০১৭)। লেবেদেফ্-চর্চা, সুপ্রকাশ, পৃষ্ঠা- ৪৬

(১৬) সমাচার দর্পন, ১৬ জুন, ১৮২২

(১৭) সমাচার দর্পণ, ১৮২২, ১৪ জুলাই

(১৮) বসু, রাম। (১৮৫৪)। সংবাদ প্রভাকর, ১৬ সেপ্টেম্বর

(১৯) সমাচার দর্পণ, ৫ মে, ১৮২৭

(২০) সমাচার দর্পণ, ১৯ আগস্ট, ১৮২৬

(২১) সম্বাদ ভাস্কর, ৩০ মার্চ, ১৮৪৯

(২২) পূর্বোক্ত

(২৩) সম্বাদ ভাস্কর, ১৭ এপ্রিল, ১৮৪৯

Citation: **Sau Bhaumik. M. & Banerjee Roy. Dr. S.,** (2025) "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার যাত্রায় রুচির বিকৃতি ও সঙ-এর উদ্ভব : একটি অনুসন্ধান", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-08, August-2025.